SABITA
A Journal of Humanities

Journal Homepage: www.sabitajournal.com

Article

কর্ম ও কর্মবাদ সমীক্ষা

রতন রায়
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, গঙ্গারামপুর কলেজ
Email: ratanroy584@gmail.com

Keywords: ভাবপদার্থ, কর্ম, কর্মবাদ, নিষ্কামকর্ম, মোক্ষলাভ।

ABSTRACT

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার প্রাকৃতিক গুণে দ্বারা মানুষ তিন প্রকার কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে- সাত্ত্বিককর্ম, রাজসিককর্ম ও তামসিককর্ম। সাত্ত্বিককর্ম হল রাগ দ্বেষ বর্জন করে শাস্ত্রবিধি দ্বারা যে কর্ম করা হয় তা হল সাত্ত্বিককর্ম। এখানে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে কর্ম করা হয়। পুরুষের দ্বারা কৃতকর্ম হল রাজসকর্ম। এই রাজসকর্ম ফল কামনাযুক্তকর্ম। এই কর্ম খুব কষ্টসাধ্য। ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার বিবেচনা না করে অবিবেকবশতঃ যে কর্ম করা হয় তাকে তাপস কর্ম বলে। গীতানুসারে এই 'কর্ম' হল ঈশ্বর সাধনা। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতম্"। বৈশেষিক মতে 'কর্ম' হল ভাব পদার্থ। তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বলেছেন-'চলনাত্মকং কর্ম'। মহর্ষি কণাদ কর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন –"একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্"। (বৈ.সূ.১।১।১৭) এই কর্মই মানুষকে জীবন মৃত্যুর আবর্তনে আবর্তিত না করে পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমি এই গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়টিকে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ভূমিকাঃ-

মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের প্রয়োজনে এই জগতের প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত থাকে। এর মূল কারণ হল সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণ। এই তিন প্রকার গুণের দ্বারা মানুষকে তিন প্রকার কর্মে প্রবৃত্ত করেন। এই কর্মক্রিয়াদিই মানুষকে এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। আবার এই কর্মই মানুষকে জীবন মৃত্যুর আবর্তনে আবর্তিত না করে পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' 'কর্ম' বলতে কর্তব্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। "গহণা কর্মণো গতি"। অর্থাৎ কর্মে'র স্বরূপ দুর্বিজ্ঞেয়। তবুও গীতায় বলা হয়েছে 'কর্ম' কর, ফলের আশা কর না।

কর্মঃ-

'কৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যোগে 'কর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'কর্ম' শব্দের অর্থ হল কাজ করা। গীতানুসারে এই 'কর্ম' হল ঈশ্বর সাধনা। আবার ব্যাকরণে 'কর্ম' হল কারক বিশেষ। তাই 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থের কারকপ্রকরণে বলা হয়েছে- 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম"। অর্থাৎ 'কর্ম' হল কর্তার ঈপ্সিততম। ইপ্সিতের মত কর্তার যা অনীপ্সিত

তা 'কর্ম' হয়ে থাকে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংঞ্জিতম্"। অর্থাৎ ভূতগণের উদ্ভব কারি যে ত্যাগ তাকে 'কর্ম' বলে। বৈশেষিক মতে 'কর্ম' হল ভাব পদার্থ। তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বলেছেন- 'চলনাত্মকং কর্ম'। মহর্ষি কণাদ কর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন –

"একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্"। (বৈ.সূ.১।১।১৭)

যে কোনও কর্মের একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। কোন নির্বোধ ব্যক্তিও উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন 'কর্ম' করতে পারেনা। তাই বলা হয়েছে- "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে"।

কর্মের ভেদঃ-

'কর্ম' প্রধানত দুই প্রকার- সকামকর্ম ও নিষ্কামকর্ম। সকামকর্ম আবার দুই প্রকার প্রারব্ধকর্ম ও অনারব্ধকর্ম। অনারব্ধকর্ম আবার দুই প্রকার সঞ্চিতকর্ম ও সঞ্চীয়মানকর্ম। মীমাংসকগণ কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করেন কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধকর্ম। কাম্যকর্ম আবার দুই প্রকার নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিককর্ম। বৌদ্ধমতে 'কর্ম' তিন প্রকার-কায়িক, বার্চিক ও মানসিক। বেদান্তসার অনুযায়ী 'কর্ম' ছয় প্রকার। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পাঁচ প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে। ব্যাকরণশাস্ত্রে কর্ম বস্তুতঃ একপ্রকার হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মুখ্য ও গৌণ ভেদে কর্ম সাত প্রকার হয়। তাই বলা হয়েছে –

"নির্বত্যং চ বিকার্যং চ প্রাপ্যং চেতি ত্রিধা মতম্।
তত্রেপ্সিততমং কর্ম চতুর্ধান্যত্তু কল্পিতম্"।।

উক্ত বিষয়ে ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন –

"যথৈবৈকমপাদানং শাস্ত্রে ভেদেন দর্শিতম্।
তথৈকমেব কর্মাপি ভেদেন প্রতিপাদিতম্"।।

কর্মকে কোথাও কোথাও আবার অর্থকর্ম ও গুণকর্ম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার তিন প্রকার গুণের দ্বারা তিন প্রকার 'কর্ম' হয়ে থাকে সাত্ত্বিককর্ম, রাজসিককর্ম ও তামসিককর্ম। তার মধ্যে সাত্ত্বিককর্ম হল রাগ দ্বেষ বর্জন করে শাস্ত্রবিধি দ্বারা যে কর্ম করা হয় তা হল সাত্ত্বিককর্ম। এখানে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে কর্ম করা হয়। পুরুষের দ্বারা কৃতকর্ম হল রাজসকর্ম। এই রাজসকর্ম ফল কামনাযুক্তকর্ম। এই কর্ম খুব কষ্টসাধ্য। ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার বিবেচনা না করে অবিবেকবশতঃ যে কর্ম করা হয় তাকে তাপস কর্ম বলে।

ভারতীয় দর্শনে শুধু সকামকর্মই কর্মবাদের অধীন, নিষ্কামকর্ম কর্ম বাদে অধীন নয়। আমাদের রাগ দ্বেষ ও মোহবশত: যে কর্ম সম্পাদন করা হয় এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যে কর্ম করা হয় তাই সকামকর্ম। সকামকর্মের ফলে জীবকে বারবার সংসার জীবনে প্রবেশ করে কর্মফল ভোগ করতে হয়। সকাম কর্ম জীবের বন্ধন সূচনা করে। সকাম কর্মের আবার নানা প্রকারভেদ বর্তমান। এই প্রকার কর্মগুলি হল অনারব্ধকর্ম ও আরদ্ধ বা প্রারব্ধকর্ম। যে কর্ম এখন ফল দান করতে শুরু করেনি তা হল অনারব্ধকর্ম। এই অনারব্ধকর্ম দুই প্রকার সঞ্চিতকর্ম ও সঞ্চীয়মানকর্ম। পূর্বজন্মের অনারব্ধকর্ম হল সঞ্চিতকর্ম এবং বর্তমান জন্মের অনারব্ধকর্ম হল সঞ্চীয়মানকর্ম। পূর্ব জন্ম এবং বর্তমান জন্মের যে সকল কর্ম ফল দান করতে শুরু করেছে তাদেরকে আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম বলে।

মীমাংসকগণ বলেছেন নিষ্কাম ভাবে বেদ বিহিত কর্ম করলে তার ফলে সঞ্চিত কর্মফলের বিনাশ হয় এবং পূর্ণ জন্ম রোধ হয়। মীমাংসক মতে কর্ম তিন প্রকার নিত্য, নৈতিক ও কাম্য কর্ম। যে কর্ম প্রতিদিন করা বিধেয় তা নিত্য কর্ম। যেমন- সকাল ও সন্ধ্যা প্রার্থনা করা, তা হল নিত্যকর্ম। কোন বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম করা হয় তা হল নৈমিত্তিককর্ম। যেমন- মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান হল নৈমিত্তিককর্ম । আর যে কাজ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করা হয় তা হল কাম্যকর্ম। যেমন- স্বর্গ সুখ লাভের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান হল কাম্যকর্ম। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বাধ্যতামূলক। এইসব কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলে পূর্বজন্মার্জিত পাপের ক্ষয় হয়।

জৈন দার্শনিকগণ আট প্রকার কর্মের কথা বলেছেন। এইসব কর্ম বন্ধনের কারণ। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞান কে আবৃত্ত করে রাখে। দর্শনাবরণীয় কর্ম সম্যক দৃষ্টি কে রুদ্ধ করে। মোহনীয় কর্ম মোহের সৃষ্টি করে। নাম কর্মের জন্য নির্দিষ্ট দেহ ও অঙ্গ পত্যঙ্গাদি লাভ করে। বেদনীয় কর্ম হল তাই যা সুখ-দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অন্তরায় কর্ম হল সেই কর্ম যা জীবকে সৎ কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে। গোত্র কর্ম বংশ অর্থাৎ জীব কোন বংশে জন্মগ্রহণ করে তা নির্ধারণ করে । আয়ুষ্য কর্ম জীবের আয়ু কতকাল হবে তা নির্ধারণ করে।

কর্মবাদ অনুযায়ী প্রত্যেকটি সকামকর্মের কর্মফল আছে এবং প্রত্যেক জীবকে স্বকৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্মের ফল হস্তান্তর যোগ্য নয় এবং ফল ভোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন কর্মের ফল ভোগ যদি একজন্মে শেষ না হয় তাহলে তা বিনষ্ট হয় না। কর্মফলের সংস্কার সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং পরজন্মে তা ভোগ করতে হয়। কর্মবাদ তাই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সর্ব কর্মফল নিঃশেষিত হলে তবেই জীবের মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয়। কর্মের সমর্থকগণ কর্মবাদের মাধ্যমে জীবের জীবন বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অপরদিকে কামনা, বাসনা মুক্ত নিষ্কামকর্মের কর্মফল নেই। কিন্তু সকামকর্মের কর্মফল আছে। বুদ্ধদেব নিষ্কামকর্ম কে ভাজা বীজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভাজা বীজের যেমন- অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নেই, তেমনিও নিষ্কাম কর্মের কর্মফল উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। নিষ্কাম কর্মের ফলে বিনাশ ও পুনর্জন্ম রোধ হয়। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' টীকাকার বালগঙ্গাধর তিলক বলেছেন- নিষ্কামকর্মই হল গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী বা তত্ত্ব। আর সেই কর্ম হবে ফলের আশা না করে কাজ করে যাওয়া। কর্মের ফল অবশ্যই আছে। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' বলা হয়েছে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করলে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি"।।

ইংরেজ মনীষী অলডাস্ হাক্সলে বলেছেন- 'অনাসক্তি মানুষকে উন্নত দুঃখহীন আনন্দময় করে'। বার বার গীতায় বলা হয়েছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ চিত্তশুদ্ধির মধ্যদিয়ে পরাজ্ঞান লাভ করে।

"তস্মাদসক্তঃ সতত কার্য কর্ম সমাচর।
অসন্তোষ হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"।।

মহাভারতের অন্যত্র এই অনাসক্ত কর্মের উল্লেখ আছে। মহাত্মা গান্ধী ও তিলক এই অনাসক্ত কর্মকেই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী রূপে গ্রহণ করেছেন। এই অনাসক্ত কর্মই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- ত্রিজগতে তাঁর কোন কর্তব্য নেই; তবুও তিনি লোক শিক্ষার জন্য কর্ম করছেন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করাই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কর্ম না করলে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পরবে।

"নিহতং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ"।।

প্রশ্ন হতে পারে দীর্ঘ ব্যবধানে কর্ম কিভাবে ফল দান করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের মতে কর্ম করলে তা থেকে এক প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তি কর্মফল প্রদান করে। যে কৃতকর্ম থেকে উৎপন্ন শক্তি পাপ কর্ম রূপে আত্মায় প্রভাব উৎপন্ন করে এবং তার পরে দ্রব্যকর্মরূপে সূক্ষ্ম পুদ্গলপরমানু সৃষ্টি করে এবং তার দ্বারা জীবের কর্ম শরীর গঠন করে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মতে জীবের কর্মজাত পাপ পুণ্য সঞ্চিত থাকে অদৃষ্টের মধ্যে। এই অদৃশ্য শক্তি অচেতন। সেইজন্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অদৃষ্ট অনুযায়ী জীবকে যথাসময়ে তার কর্মফল দান করেন। মীমাংসকগণ বললেন যে বেদ ব্যতীত কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলেও স্বর্গ লাভ হয়। ইহলোকে যাগ-যজ্ঞ যথাবিহিত সম্পাদন করলে আত্মার মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যার নাম 'অপূর্ব'। এই 'অপূর্ব' যথাসময়ে কর্মফল প্রদান করে। ভাল কর্মের জন্য ভাল ফল, মন্দ কর্মের জন্য মন্দ ফল। এই কর্ম ও কর্মফলের চিন্তা ভারতীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিক কর্মবাদে বিশ্বাসী। এই কর্মবাদ হল নৈতিক জীবনের একটি সার্বিক কার্যকারণ বিধি। এই বিধির মূল কথা হল কর্মফল কর্ম অনুসারী এবং কর্মফল ভোগ কর্মফল অনুসারী। মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনি ফল লাভ করে। ভোগ ব্যতীত কর্ম কখনো নাশ হয় না। দেহান্তে স্বর্গে কিংবা নরকে গমন মানুষের ভালো মন্দ কর্মের উপর নির্ভর করে। পাপ কিংবা পূর্ণ কর্ম কখনো অপরের দ্বারা কৃত হয় না, তা নিজের দ্বারাই কৃত হয়। তাই তার ফল ভোগ নিজেকেই করতে হয়। আবার এই স্ব-অর্জিত ফল ভোগ করতে মানুষ বাধ্য। কোন কর্মফল বিনষ্ট হয় না বা তাকে হস্তান্তর করা যায় না। বৌদ্ধ কর্মবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের একটি রূপমাত্র। প্রতীত্যমুৎপাদবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ঘটনার একটি পূর্ববর্তী কারণ থাকবে। আমাদের বর্তমান জীবন আমাদের অতীত কর্মের ফল এবং আমাদের বর্তমান কর্ম আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে তা নির্ধারণ করে। নাগসেন বলেছেন- "কর্মের পার্থক্য হেতু সব মানুষ একই প্রকার হয় না। কেউ হয় স্বল্প জীবী, কেউবা হয় দীর্ঘজীবী, কেউ সশ্রী, কেউ কুৎসিত ইত্যাদি"। কর্মফল ভোগ যদি এক জীবনে শেষ না হয় তবে পরজন্মে তা ভোগ করতে হয়। কিন্তু এই ফলভোগের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের মেনে নেওয়ার প্রয়োজন বুদ্ধদেব অনুভব করেননি। এক ফল ভোগ ব্যাপারটি কার্যকারণ বাদ নিয়মানুসারে হয়ে থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মতে কর্মনিয়ম স্ব-শাসিত এবং এই নিয়ম স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এই কর্মবাদের মূলটি নিহত আছে বৈদিক সাহিত্যে 'ঋত'এর ধারণায়। একটি চিরন্তন জাগতিক নিয়ম বেদে স্বীকার করা হয়েছে যার নাম 'ঋত'। এই 'ঋত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ – 'ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম'। ধর্মের নিয়ম এবং নৈতিক নিয়ম চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য বলে 'ঋত' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এই 'ঋত' মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' নামে পরিচিত হয়েছে। 'অপূর্ব' হচ্ছে সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা যা বর্তমানে সম্পাদিত যজ্ঞের ফলস্বরূপ ভবিষ্যৎ সুখলাভের আশ্বাস দেয়। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে 'ঋত' অভিহিত হয়েছে 'অদৃষ্ট' নামে। 'অদৃষ্ট' হল এমন একটি নিয়ম যা পরমাণুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিক নিয়মানুযায়ী বস্তু সৃষ্টি করে। আবার এই ঋতে'র ধারণাই পরবর্তী যুগে কর্মবাদে পরিণতি লাভ করেছে। কর্মবাদকে তাই নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম বলা হয়ে থাকে।

বেদে এক একটি যজ্ঞের এক একটি ফল নির্ধারিত ছিল। দার্শনিকগণ বললেন কেবল যজ্ঞ নয়, যে কোন কর্মই ফল দান করে। এই ফল অবশ্যভোগ্য। এই কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের শুভ, অশুভ, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি নৈতিক মূল্যগুলি। তাই কর্মবাদকে বলা হয় নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম। ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগ এর তারতম্যের ব্যাখ্যা কর্মবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। একই সুযোগসুবিধা পেয়েও একজন প্রভূত সুখ ভোগ করে। আবার অপরজন দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। কর্মবাদ স্বীকার না করলে এ ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল দান করে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্নও আসে -তাহলে প্রথম কর্ম কিভাবে এল ? প্রত্যেক কর্মই পূর্বে কৃতকর্মের ফল। এক্ষেত্রে প্রথম কর্মকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় ? এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিক বললেন এই কর্মচক্রের প্রক্রিয়া অনাদি। মোক্ষ লাভে এর সমাপ্তি ঘটে। এই কর্মবাদ হল জন্মান্তরবাদের ভিত্তি। এই জন্মে যদি কৃতকর্মের ফল ভোগ সম্পূর্ণ না হয় তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পরজন্মে ঐ ফল ভোগ করতে হবে। সকাম কর্মের ফল ভোগ অবসম্ভাবী। তাই পুনর্জন্ম স্বীকার্য। একমাত্র নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা এই কর্মচক্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কর্মবাদীদের মতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ নয়। এই তিন কাল এক কর্মসূত্রে গ্রথিত। 'সংসরতি ইতি সংসারঃ'। জন্ম মৃত্যুর পুনঃ পুনঃ আবর্তন হল সংসার। শঙ্করাচার্য তাই বলেছেন –"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্ ইতি সংসারঃ"। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' শ্রীপার্থ সারথি বলেছেন- "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু - ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্য চ"। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হবে, একে সংসার বলে। বৌদ্ধ দর্শনে একে 'ভবচক্র' বলা হয়। সনাতন আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধ গণ কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং জন্মান্তরবাদও স্বীকার করেন। কেবলমাত্র চার্বাক কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। কর্মবাদ এর উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। সেই কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে-

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহি কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি"।।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' জন্মান্তরবাদ কে নতুন বস্ত্র 'পরিধান', বৌদ্ধ দর্শনে 'ভবচক্র' এবং বেদান্ত দর্শনে নিত্য ও সনাতন আত্মা স্বীকারের মাধ্যমে সমর্থন করা হয়। জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কর্ম এক প্রকার শক্তি সৃষ্টি করে এবং এই শক্তিকে কর্মফল প্রদান করে। জৈন দর্শনে এই শক্তিকে কষায় মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' বৌদ্ধ দর্শনে সংস্কার নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও সাংখ্য দর্শন ঈশ্বর না মানলেও তারা কর্মবাদ কে একটি স্বতন্ত্র নৈব্যক্তিক নিয়ম বলেছেন। এটি ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জীবগণের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল দান করে। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর এই কর্ম চক্র কে নিয়ন্ত্রন করে। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্বাধীনতা নেই। এই বিশাল বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এখানে তার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু বর্তমান দেহে সুকর্মের দ্বারা সে ভবিষ্যতে ভাল ফল ভোগ করতে পারে- এই স্বাধীনতা তার আছে। এই ভাবনায় কেবল দৈবনির্ভরতা নেই। কর্মবাদে বিশ্বাসী মানুষের জীবনকে সুপথে পরিচালিত করে। অতীতের কর্মফল লাভ করার সময় সে বিনীত হতে শেখে। আবার নিজ ভবিষ্যৎ কে নিজ হাতে গড়ে তোলার সুযোগ ও সে পায় সাধুকর্ম অনুষ্ঠান এর দ্বারা। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মানুষ কর্ম চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। কর্মবাদ এর এই তত্ত্বটির জন্যই এই মতবাদ অদৃষ্টবাদে পর্যবসিত হয় নি।

উপসংহারঃ-

কর্মবাদ বর্তমান জন্মের মানুষকে স্বেচ্ছায় সৎকর্মে নিযুক্ত হয়ে ভাবি জীবনের উন্নতিবিধান সুনিশ্চিত করতে পারে।

দৈব হল কৃতকর্মের ফল মাত্র। আপন কর্মশক্তির অতিরিক্ত কোনো শক্তিকে জৈব বলা যায়না। তাই কর্মবাদ নিয়ন্ত্রণবাধ বা অদৃষ্টবাদ নয় কর্মবাদ হল নিয়ন্ত্রণ নয়। কর্মবাদ একদিকে যেমন ও নিয়ন্ত্রণ বাধের বিরোধী অপরদিকে তেমনি ও ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা কে স্বীকার করে নেওয়া হলে জীবের নৈতিক দায়িত্ব খণ্ডিত হয়নি। মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে তা বিনম্র তার সাথে গ্রহণ করা বিধেয়, কেননা এগুলি আমাদের অতীত কর্মের ফল। তবু ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন এবং আমরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারি। কর্মবাদ ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ এবং অতীতের কাজে বিনতি শেখার প্রণোদিত করে কর্মবাদ এর জন্যই মানুষ অনুভব করতে পারে যে জাগতিক জিনিস জগতের ঐশ্বর্য ও বঞ্চনা কোন কিছুই মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কর্মবাদ সুখের বিরোধী কারণ এবং সাধু সাধু সকল কর্ম ফল দান করে। এবং এই ফল ভোগ এর জন্যই জন্মগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই কর্মবাদ তত্ত্বে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য যে নিষ্কাম কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, তা সুখের সমান বলেই গণ্য হয়। তাই শ্রীমদভগবদগীতায় শ্রী ভগবান বলেছেদ- "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। হে পার্থ! তোমার কেবল কর্মে অধিকার। কর্ম ফলে তোমার কখনই কোন অধিকার নেই। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্ম কর। তাই ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে –

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে"।।

মানুষের শতবর্ষ পরমায়ু। কর্ম করতে করতেই তা অতিবাহিত করতে হবে। সুতরাং কর্মবাদ এর সঙ্গে মোক্ষের কোনো বিরোধ নেই। কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল কখনোই নষ্ট হয় না। কর্মফলের মধ্য দিয়ে শুভ অশুভ পাপ ও পুণ্য সংরক্ষিত থাকে। কর্ম হচ্ছে কারণ আর সুখ-দুঃখ ভোগ হচ্ছে কর্মফল। সৎকাজের জন্য পুণ্য এবং অসৎ কাজের জন্য পাপ ভোগ করতে হয়। কর্ম এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন করে যার ফলে যে জীব কর্ম অনুসারে ভবিষ্যতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ
References:

১। ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বেদান্তদর্শনম্, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯১।
২। মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার (সম্পা.), ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।
৩। মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সচ্চিদানন্দ (সম্পা.), সিদ্ধান্তকৌমুদী (কারক প্রকরণ), সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১।
৪। সাহা, বিশ্বরূপ (সম্পা.), তর্কসংগ্রহ ও দীপিকা, শ্রী বলরাম প্রকাশন্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।
৫। সেন, ডক্টর দেবব্রত (সম্পা.) ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।
৬। স্বামী, শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১২৯২।